কবি শামসুর রহমান সময়ের মুখোমুখি

তণ মুখোপাধ্যায়

।। এক ।।

সময়চেতনাকে তাঁর কাব্যের অপরিহার্য সত্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর পরবর্তীকালের কবিরা প্রায় সকলেই সময়বাহিত সমবাহিত কবি; সময়াহত - ও। সাধারণভাবে সময়ের ব্যাখ্যা এই, তা' কালবাচক -- দিন ও রাত্রি। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করার পর কিভাবে 'সময়' উৎপাদন করলেন, তা সহজভঙ্গিতে ব্যাখ্যা কর া হয়েছে।

Then God commanded, 'Let lights appear in the sky to separate day from night to show the time when days, years and religious festivals begin; etc.

কালবাচকতার সঙ্গে সঙ্গে 'সময়' হয়ে ওঠে কালান্তকও। জন্ম আর মৃত্যু বিভাজিকার প্রতীক সময়। যার প্রহারে কবি কিট্‌স্ বলেন 'ড্রন্দ্বজন্দ্ব ন্ধ্রব্রব্ধন্তন্তু ঞ্সব্ধ ঞ্সন্দ্বন্দ্বন্ম ড়ন্দ্বক্ত প্তব্রব্দব্ধক্তঞ্সব্রব্দ ন্দ্বন্তন্দ্বব্দ.' আর কবি সুইনবার্ণ বলেন, 'ট্প্তপ্ত ভ্রন্দ্ব ভ্রন্দ্বক্তজন্দ্ব ঞ্সপ্তস্তুক্রস্তু ভ্রনব্ধড়ন্দ্বক্ত প্তনঞ্সন্দ্বত্র প্তন্দ্বন্দ্র.' সময়ের ব্যাখ্যার তবু শেষ নেই। দার্শনিক, কবি ও বিজ্ঞানীর চোখে সময় কেমন তার দৃষ্টান্ত দিই।

1. a present of past things;

ত্র ন্মাক্তজন্দ্বব্দন্দ্বব্ধ ঞ্সন্দ্র ন্মাক্তজন্দ্বব্দন্দ্বব্ধ ব্ধড়ন্তব্ধব্দু

ত্র ন্মাক্তজন্দ্বব্দন্দ্বব্ধ ঞ্সন্দ্র ন্দ্রব্রব্ধব্রক্তজন্দ্ব ব্ধড়ন্তব্ধব্দ. (সন্ত অগাস্টিন)

2. বনপ্পন্দ্ব ত্নক্তজন্দ্বব্দন্দ্বব্ধক্রস্তু ব্ধনপ্পন্দ্ব ন্মত্রব্দব্ধ

টক্তজন্দ্ব স্থাব্ধড় ন্মান্দ্বক্তজড্রন্মাব্দ ন্মাক্তজন্দ্বব্দন্দ্বব্ধ ন্ত ব্ধড়ন্দ্বনক্তজ ন্দ্রব্রব্ধব্রক্তজন্দ্ব

টুস্তু ব্ধনপ্পন্দ্ব ন্দ্রব্রব্ধব্রক্তজন্দ্ব ন্তুঞ্সব্ধন্তন্দ্বস্তু ন্ত ব্ধনপ্পন্দ্ব ন্মত্রব্দব্ধ. (টি . এস. এলিঅট)

2. The Thermodynamic Arrow of time

বড়ন্দ্ব ত্নব্দন্তুড়ঞ্সপ্তঞ্সন্ধন্তত্রপ্ত টক্তজক্তঞ্সভ্র ঞ্সন্দ্র ব্ধনপ্পন্দ্ব

বড়ন্দ্ব ট্রঞ্সব্দপ্পঞ্সপ্তঞ্সন্ধন্তত্রপ্ত টক্তজক্তঞ্সভ্র ঞ্সন্দ্র ব্ধনপ্পন্দ্ব (স্টিফেন হকিং)

এই সময়ের ঘূর্ণাবর্তে মানুষের হওয়া আর না - হওয়া; চলা বা থেমে যাওয়া। বদ্ধ সময় থেকে মুক্ত সময়ের দিকে অভিয াত্রাই মানুষেব উদ্দেশ্য। আর সেই যাত্রা পথে দেশ - কাল - সমাজ তার শরীরে যে সময়ের উল্কি এঁকে এঁকে দেয়, তাই ত ার রাজটিকা।

তাঁর ''কবির কর্তব্য'' প্রবন্ধে শামসুর রাহমান কবির (বা শিল্পীর দায়বদ্ধতা নিয়ে নানা যুক্তি ও সারগর্ভ ভাবনা উপস্থাপন করেছেন। সাহিত্য নিছক প্রমোদমূলক তিনি মানেন নি। প্লেটো বা টলস্টয় যাই বলুন না কেন, কবি কিট্‌সের মতো তিনি বিশ্বাস করেন, কবিতার মৃত্যু নেই। বিশ্বাস করেন কবিরা পলাতক নন। ইতালিয় কবি দান্তে, স্প্যানিশ কবি লোরকা, ফরাসি কবি আরাগঁ, তুর্কী কবি হিকমত প্রমুখের দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন, যাঁরা শাসক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা

করেছেন; লাঞ্ছিত, পীড়িত হয়েছেন মৃত্যুবরণ করেছেন। যে রবীন্দ্রনাথ 'অকাজের কাজ যত' 'আলস্যের সহস্র সঞ্চয়' -- কে বরণীয় ভাবেন, তিনিই "এবার ফিরাও মোরে" বলে কল্পনার কাছ থেকে ছুটি চান। দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। বঙ্কিমচন্দ্রও সৌন্দর্যসৃষ্টির পাশে চিত্তশোধন করার কথা, দেশ দশের হিতসাধনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

একালে রাজনীতি তথা দলীয় মতামত প্রাধান্য পাওয়ায় কবি - শিল্পী - লেখকরা বিভ্রান্ত বা ভীত হন -- কিংকর্তব্য ভাবেন। শামসুর রাহমান স্পষ্টই জানান, শিল্পকে জলাঞ্জলি দিয়ে রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারের জন্য কবিতা লেখা কাম্য নয়। তিনি এঙ্গেলসের মন্তব্য তাঁর সমর্থনে উদ্ধৃত করেছেন -- 'একজন লেখকের নিজস্ব মতামত যত বেশী লুকানো থাকে , শিল্পকর্মের জন্য তা' ততই কল্যাণকর।" তাঁর প্রবন্ধে "কবির কর্তব্য" রূপে তিনি যা বলেন, তা এই ---

(১) যুধিষ্ঠিরের মতো আশেপাশের সকল কিছুর প্রতি দৃষ্টি রেখে বাণীসিদ্ধির সাধনায় নিমগ্ন থাকাই একজন কবির কর্তব্য।
(২) জাতির ভাষাকে সজীব ও পরিশুদ্ধ করে তোলাই কবির অন্যতম প্রধান কাজ।
(৩) কোনো রাজনৈতিক মতবাদ কিংবা পার্টির নির্দেশ কবির ওপর চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত। ... কবিকে তাঁর নিজের মত করে কবিতা লিখতে দিতে হবে।
(৪) চার্লি চ্যাপলিন বলেছেন, 'শিল্প হল পৃথিবীর উদ্দেশে সুলিখিত পত্ররচনা।' এই পত্ররচনাই কি শেষ পর্যন্ত কবির কাজ? হ্যাঁ, তবে সেই পত্রে থাকতে হবে দেশকে ও মানুষকে বাঁচানোর মন্ত্র, সকল পশুশক্তির বিদ্ধে লড়াই - এর অঙ্গীকার।

পাবলো নেদা, চিলির বিখ্যাত কবি এমনই দায়বদ্ধতার কথা লেখেন। যেসব মানুষ লিখতে জানে না, বলতেও পারে না, তাদের অভাব - দুঃখ - অভিযোগ বলতে ও লিখতে হবে কবিকে। অর্থাৎ কবি 'ষ্প্রন্সন্দ্ব ড়নপ্পব্দন্দ্বপুন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ব্দম্প্নপ্সন্সন্দ্বব্দপ্পু প্সন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ড়ব্বপ্পু স্তুপ্সস্তুনব্ধনপ্সব্দ.' ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে পি. ই. এন. কংগ্রেসে এই ছিল তাঁর প্রধান বক্তব্য। আমাদের জীবনানন্দ যখন বলেন, কবিকে তাঁর প্রতিভার কাছে বিশ্বস্ত থাকতে হবে, সৎ কবিতা লিখতে হবে, তখনও আসে সেই দায়দায়িত্ববোধের কথা। যা অবশ্যই সময়চেতনা - সঞ্জাত।

বিংশ শতাব্দীর পাঁচদশকের কবিরূপেই আমরা শামসুর রাহমানকে চিনি। যাঁর জন্ম ১৯২৯ও ২৪ অক্টোবর। এম. এ. পড়া অসমাপ্ত রেখে সাংবাদিকতাকে পেশারূপে গ্রহণ করেন। সম্পাদনা করেন দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "প্রথমগান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে" প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। তাঁর লেখালেখি প্রসঙ্গে কবি নিজে বলেছেন,

...আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর '৪৭ এর পরবর্তী সময়ে আমি লিখতে শু করেছি। তারপর অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে।যেমন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হয়েছে।' ৬৯ এর গণ - আন্দোলন দেখেছি। ১৯৬৯ এর গণ - আন্দোলন দেখেছি। ১৯৬৯এর গণ - আন্দোলন আমার লেখাকে বিষয়গত দিক থেকে অনেক পরিবর্তন করে দিয়েছে। তখন আমার মধ্যে রাজনৈতিক -সামাজিকভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। (কবিতাভাবনা ও কবিতা / এবং মুশায়েরা, শারদীয় ১৪০৮)

এই নিবন্ধেই কবি তাঁর কাব্যাদর্শ ও সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন --- ...আমার মধ্যে যন্ত্রণা আছে, আমার মধ্যে ক্রোধ আছে, ঘৃণা আছে, ভালোবাসা আছে, সেটাই আমি প্রকাশ করি। ...একজন কবি বা শিল্পীর দু'ধরনের দায়বদ্ধতা আছে, এক তার শিল্পের প্রতি এবং সমাজের প্রতি।

আমি কবিতার কাছে দায়বদ্ধ, সমাজের কাছে দায়বদ্ধ, আমি শিল্পের কাছে দায়বদ্ধ। আমার এই দায়বদ্ধতা থেকেই আমি লিখি। (তদেব)

।। দুই ।।

বাংলাদেশের কবিতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আর পরিণতির বিবরণ দিতে গিয়ে হায়াৎ সাইফ জানিয়েছেন, ১৯৪৭ থেকে ১৯৬০ ও তার পরবর্তীকালে পর্যন্ত "বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে কবিতা অগ্রসর হয়েছে।" পাকিস্তানী শাসকদের অত্যাচার,

প্রসঙ্গত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘‘কাব্যের মুক্তি’ প্রবন্ধের ভাবনা উদ্ধৃত করা যায়। ... ‘‘কবির কর্তব্য তার প্রতিদিনের বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতায় একটা পরম উপলব্ধির মাল্যরচনা। কবির উদ্দেশ্য তার চারপাশের অবিচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গে প্রবহমান জীবনের সমীকরণ। কবির ব্রত তার স্বকীয় চৈতন্যের রসায়নে শুদ্ধ চৈতন্যের উদ্‌ভাবন।’’
...‘‘এবং সময় - রূপ চতুর্থ আয়তনের মার্গে শাশ্বত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যতক্ষণ না মিলতে পারছে। ততক্ষণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিতান্ত মূল্যহীন।’’

অবিচারের বিদ্ধে ষাটের দশকে গণমানসে যে বিরূপতা ও বিক্ষোভ জন্ম নিয়েছিল, তা’ নানা আন্দোলনে, প্রতিবাদে, ধর্মঘটে ব্যক্ত হয়। সাহিত্যে যা প্রতিফলিত হয়েছিল। এর সঙ্গে পরে যুক্ত হয় বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। ‘‘বাংলাদেশের কবিতা অন্বেষণ ও উপলব্ধি’ প্রবন্ধে হায়াৎ সাইফ আরো জানান, পঞ্চাশে লেখালেখি শু করলেও, ষাটের দশকেই কবি রূপে শামসুর রাহমান স্বীকৃত হন। তাঁর পাশে পাওয়া যায় আরও দুজন উজ্জ্বল কবিকে -- আল মাহমুদ ও শহীদ কাদরী। প্রথম পর্বে শাসমুরের কবিতায় তিনি দেখেছেন ‘জীবনানন্দীয়’ প্রভাব ও ‘কীট্‌সীয় ইন্দ্রিয় অ াবেশ।’
‘‘বাংলাদেশের কবিতা’’ শীর্ষক প্রবন্ধে মোহাম্মদ হাণ - উল - রশিদ পাঁচের দশকে বাংলাদেশের (বা পূর্ব বাংলার) কাব্য - রচনার তিনটি ধারা দেখেছেন।
প্রথম ঐতিহ্যতাড়িত। যার মধ্যে দুটি উপধারাও মিশেছে -- ইসলামি ও রাজনীতি - আশ্রিত ধারা
দ্বিতীয় রবীন্দ্রবলয়িত। তবু আধুনিকতায় আক্রান্ত।
তৃতীয় উত্তর রবীন্দ্রযুগের তিরিশের বাঙালি কবিদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ এবং অভিব্যক্তিবাদ ও মার্ক্সবাদে অনুপ্রাণিত ধারা।
তাঁর মতে, ‘‘পঞ্চাশের দশক বাংলাদেশের কবিতায় শৈশবকাল।’’ যেখানে প্রধান কবির নাম শামসুর রাহমান। যদিও তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে ষাট দশকে।
হাণ - উল - রশিদ বাংলাদেশের কবিতায় আধুনিকতার পটভূমি নির্মাণে তিনটি ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রথম ঘটন ারকাল ১৯৫০। যখন ‘‘নতুন কবিতা’’ নামে নবীন কবিদের সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সংকলনেই প্রথম পাওয়া যায় ‘‘ব ামপন্থী ভাবধারায় পুষ্ট, ভাষাসচেতন, ভাবালুতার বদলে বুদ্ধিবৃত্তির প্রচ্ছায়ায় লালিত আঙ্গিকে আধুনিক ও দুরূহতায় অ াক্রান্ত’’ কবিতা। যা পরবর্তীদশকের বাংলাদেশের কবিতা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।
দ্বিতীয় ঘটনাটি তাঁর মতে ঐতিহাসিক। ১৯৯৫২র ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন ও শহীদ হওয়ার ঘটনা সত্যই যুগান্তকারী। ষাটের দশকে এর ফলে বাংলা কবিতায় গুত্ব পায় ‘‘প্রতিবাদ, স্বদেশ ও ভাষানুরাগ।’’
তৃতীয় ঘটনাটি ঐ ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ‘‘একুশে ফেব্রুয়ারী’’ কাব্যসংকলন প্রকাশিত হয় যেখানে ভাষা - প্রেম, প্রতিবাদ আর মা রূপিণী স্বদেশের বন্দনা স্থান পেয়েছে। অনেক কবি এসময়ে বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করলেও, তাঁর মতে ‘‘তবু অ াজ একথা অস্বীকার করা যায় না। যে শামসুর রাহমানকে ঘিরেই আমাদের আধুনিক কবিতার প্রাণউদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।’’
অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ কবি শামসুর রাহমানকে নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ (নিঃসঙ্গ শেরপা) লেখেন। এই গ্রন্থে তিনি ঘে াষণাকরেন, শামসুর রাাহমান-ই সে - শক্তিমান ও ভাগ্যবান আধুনিক, এবং সর্বাংশে আধুনিক, যার কবিতা আধুনিক চেতনাচৈতন্য - সংবেদনশীলতার উন্মেষচিহ্নখচিত নয় শুধু, বরং সমৃদ্ধ আধুনিক চেতনার উজ্জ্বল উৎসারণ।
প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কবিরূপে শামসুরের মধ্যে অধ্যাপক আজাদ দেখেছেন,
১. পরিশ্রুত ভাষা ব্যবহার
২. কবিতার নতুন ব্যাকরণ
৩. অভিজ্ঞতার সারাৎসার
৪. নতুন সংবেদনশীলতা
৫. কলাকৌশলে অভিনবত্ব

৬. ভবিষ্যৎ জীবনবোধের ইঙ্গিত
যেহেতু তিনি সময়সচেতন বা স্বকালচেতন, তাই তাঁকে সংগতভাবে তিনি ‘‘সমকালের সভাকবি’’ অভিধা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কবির স্বীকারোক্তি ---
...আমার কবিতা হয়ত আত্মকেন্দ্রিক ছিল। আমার কবিতা সেসময় প্রতিবাদী ছিল না। তবু আমার অবস্থান সবসময় ছিল বামপন্থার দিকে।... আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে মার্কসবাদী কিংবা কমিউনিস্ট বলি না। কারণ একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট হওয়া কঠিন। ...কিন্তু হ্যাঁ, আমি বরাবরই প্রগতির সপক্ষে আছি।
(সাক্ষাৎকার / বাংলা প্রগতি কবিতার নানা প্রত্যন্ত নীতীশ বিশ্বাস ও মুকুলেশ বিশ্বাস সম্পাদিত)
উল্লিখিত সাক্ষাৎকারেই তিনি জানান, শুধু লিখেই দায় শেষ করেন না। প্রয়োজনের মিটিং, মিছিলে যান। স্বৈরতন্ত্রের বিদ্ধে কথা বলেন। চাকরি ত্যাগ করার পিছনে আছে সেই সক্রিয় প্রতিবাদ। তাঁর সব লেখা ও কাজের পিছনে আছে সমকালীন অভিজ্ঞতা, আঘাত এবং ‘সামাজিক দায়বদ্ধতা’। এখানেই তিনি সময়ের মুখোমুখি কবি।
কবিরূপে শামসুর রাহমানের কবিতায় আমি যেসব প্রবণতা খুঁজে পাই, সেগুলি পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে আলোচনা করলে, তঁার কবিকৃতির ধারণা পাওয়া যাবে।
১. রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর ভাবনা
২. আত্মসমীক্ষা
৩. বাংলাভাষাপ্রেম
৪. জন্মভূমিপ্রীতি ও স্বাধীনতাবোধ
৫. প্রেম ও যৌনচেতনা
এছাড়াও তাঁর কবিতায় পাই পুরাণচেতনা, চিত্রকল্পরচনার দক্ষতা।

।। তিন ।।
একথা সত্য, শামসুর রাহমানের কবিজীবন শু হয়েছিল প্রধানত জীবনানন্দ দাশ ও পরে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যভাবচ্ছায়ায়। কুড়ি বছর বয়সে শামসুর ‘১৯৪৯’ শিরোনামে যে কবিতা লেখেন, তার মূলে ছিল অবশ্যই জীবনানন্দের ‘‘১৯৪৬ - ৪৭’’ নামাঙ্কিত সুখ্যাত কবিতার প্রেরণা। দুই বাঙালি কবির কাছে তাঁর ঋণ কিসের, ব্যাখ্যা করেছেন হুমায়ুন আজাদ। প্রাগুক্ত গ্রন্থে বলেছেন, ‘‘জীবনানন্দ, তাঁকে দিয়েছেন বিষণ্ণ মনোবিশ্ব --- কবিতার রূপোলি অন্তর্লোক; অন্যজন, সুধীন্দ্রনাথ, তাঁকে দিয়েছেন শব্দের উজ্জ্বল পাথর --- কবিতার বহির্লোক।’’ বিদেশি কবিদের মধ্যে তিনি বোদলেয়ার, এলিঅট, পাউন্ড, ডিলান টমাস এবং ঔপন্যাসিক আলব্যের কামুর রচনাগুলির দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত। শামসুর রাহমানের রৌদ্র - চেতনার পিছনে আছেন বোদলেয়ার। ‘‘যখন রবীন্দ্রনাথ’’ কবিতায় এলিঅটের ‘দি ওয়েস্টল্যান্ডের’ ছায়া পড়েছে দেখা যায়। ‘‘যদি ইচ্ছে হয়’’ কবিতায় আছে এজরা পাউন্ডের অনুসরণ। ‘‘সেই হাত’ নামের কবিতা তো ডিলান টমাসের ‘বড়ন্দ্ব ঙ্খ্রুস্তু ঋড্রুঋ ব্দনঙ্কন্দ্বস্তু ঋড়ন্দ্ব ত্নন্মন্দ্বজ্ঝ.’ কবিতার প্রতিচ্ছায়া। শামসুরের কবিতায় দিনযাপনের ক্লান্তি, আত্মহননেচ্ছা প্রত্যক্ষভাবে কাম্যুর ‘সিসিফাস’ তথা অ্যাবসার্ডিটি তত্ত্বের আলোয় উদ্‌ভাষিত। (দ্র. নিঃসঙ্গ শেরপা / হুমায়ুন আজাদ)।
তবু রবীন্দ্রনাথ নামক ‘ত্নড়ন্দ্বক্সপ্পন্দ্বক্সঙ্ক’ কোনো ভারতীয় বা বাঙালি কবির পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনদশকে বা তিরিশের কবিরা এপার বাংলায় প্রাণপণে চেয়েছিলেন অরাবীন্দ্রিক হতে; রবীন্দ্রদ্রোহী হতে। পারেন নি। শেষপর্যন্ত তাঁরা স্বীকার করেছিলেন ----‘‘সাগরে যে গঙ্গা আমি সে তোমারি আনন্দভৈরবী।’’
পাঁচের দশকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তথা কৃত্তিবাস - গোষ্ঠী তিনজোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্ররচনাবলী ভূলুণ্ঠিত করেও, মধ্যবয়সে তা অনুতাপে ও শ্রদ্ধায় বুকে তুলে নেন। ভুল স্বীকার করেন। শামসুর রাহমান তাঁর রবীন্দ্র - ভাবনাকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তাতে ওপার বাংলার কবিদের সঙ্গে তাঁর চেতনার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আল মাহমুদ তাঁর ‘‘রবীন্দ্রনাথ’’ কবিতায় এই বলে খেদ জানান ---
শুনুন, রবীন্দ্রনাথ আপনার সমস্ত কবিতা
আমি যদি পুঁতে রেখে দিনরাত পানি ঢালতে থাকি

নিশ্চিত বিশ্বাস এই, একটিও উদ্ভিদ হবে না।
আপনার বাংলাদেশ এরকম নিষ্ফলা, ঠাকুর!
শামসুর রাহমানের দুই সময়সীমায় লেখা রবীন্দ্রবিষয়ক দুটি কবিতা এরি পাশে পড়া যাক।

আমার দিনকে তুমি দিয়েছ কাব্যের বর্ণচ্ছটা ---
রাত্রিকে রেখেছো ভরে গানের স্ফুলিঙ্গে, সপ্তরথী
কুৎসিতের ব্যূহ ভেদ করবার মন্ত্র আজীবন
পেয়েছি তোমার কাছে। (রবীন্দ্রনাথের প্রতি)
তাঁর এ কবিতা পাই ১৯৬৩ -তে প্রকাশিত ''রৌদ্র করোটিতে'' কাব্যগ্রন্থে। ঠিক কুড়ি বছর পর প্রকাশিত 'কবিতার সঙ্গে গোরস্থালি'' কাব্যে ও নামকবিতায় ফিরে আসেন সে রবীন্দ্রনাথ। সাত - আট বছরের বালক যখন শুনছে ''চয়নিকা'' থেকে আবৃত্তি ''ভারততীর্থ''। আর
মহামানবের সাগরতীরে -- এই শব্দগুচ্ছ
আমার সত্তায় জলরাশির মতো গড়িয়ে পড়তো বারংবার।
তবু সেদিন 'রবীন্দ্রনাথ' তাঁর কাছে ছিলেন 'শুধু একটি নাম।' বহু পথ পাড়ি দিয়ে 'নিজস্ব রবীন্দ্রনাথকে' পরের আবিষ্কার করেছেন কবি --- সেই শু তাঁর 'কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি।' চয়নিকার পর এলো সঞ্চয়িতা। এলেন এলিঅট, এলুয়ার, অ
ারাগঁ আর তিরিশের কবিগন্ধর্বেরা তণ্যের তেজে
স্বভাবত স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরে সরে গেলাম
ভিন্ন স্বাতন্ত্র্যের আকুল সন্ধানে।
কিন্তু সরে যাওয়া কি সম্ভব? রবীন্দ্র-চৌম্বকশক্তির কাছে আমরা সবাই সগর্বে গৌরবে পরাজয় মেনে নিই। কবির অকপট স্ব
ীকারোক্তি ---
বয়স যতই বাড়ছে, ততই আমি সেই সমুদ্রের দিকে
যাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ যার নাম, যেমন যাচ্ছি
দান্তের বিপুল বিশ্ব; যেমন ভীষণ ক্ষ
নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তন করছি নিজ বাসভূমে।
ঐতিহ্যের এই স্বীকরণে আর স্বীকৃতিতে শামসুর রাহমান শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন।

।। চার।।
আত্মবীক্ষণ ও সমীক্ষণ ছাড়া কোনো সৎকবি বড়ো কবি হতে পারে না। যে দেশ-কাল - পরিবেশে তিনি লালিত, তার প্রভ াব শুধু নয়, তার প্রয়োজনীয়তা বিবেকী মানুষকে প্রাতুর করে তোলে। 'এই জীবন লইয়া কি করিব' বিখ্যাত বঙ্কিমী - জিজ্ঞ াসা যথার্থ মনুষের অন্তরের প্রা হতে বাধ্য। শামসুর রাহমান আত্মজিজ্ঞাসু কবি। যেজন্য হুমায়ুন আজাদ বলেন,
আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মকথনে তিনি বাংলাভাষায় সম্ভবত অদ্বিতীয়; ...
আত্মবিবরণীর এ - প্রাচুর্যে মনে হতে পারে যে তিনি লাওএল - প্লাথ - রেটকি - বেরিম্যান - সেক্সটন গোষ্ঠীর মতো স্বীকারো ক্তিপ্রবণ; এবং তাঁর কবিতা স্বীকারৌক্তিক কবিতা।
তবু হুমায়ন আজাদ মনে করেন, তাঁর 'আমি আসলে ''চিরকালের কবিদের অপরিহার্য 'আমি'। এইজন্য আমার মনে হয়, পঞ্চাশের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তিমূলক কবিতার সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না। আজাদের মন্তব্য, শ্যামসুর ''অ াত্মজীবনকে কবিতা করেন নি।''
''রৌদ্রকরোটিতে'' কাব্যে ''আত্মপ্রতিকৃতি'' নামে যে কবিতাটি পাই, সেখানের কবির আত্মসমীক্ষা ও বিষাদ যেন মিশে গেছে। শুতেই কবি জানান---
আমি তো বিদেশী নই, নই ছদ্মবেশী বাস ভূমে ---

তবে কেন পরিচয় অন্ধকার ঘরে ঢাকা,
কবির এই আত্মদর্শনে মিশে গেছে দান্তে, রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দের ভাবনা। ডডন্নন্দদ্ব ট্রম্পপ্পন্দ্বস্তুম্ভ তে দান্তেও জানান 'নিজেকে দেখি এক নিরন্ধ্র বনে'। আর বিষ্ণু দে লেখেন, "মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি এক বিদেশী পথিক।" উভয়ের ক্ষেত্রে এই আগন্তুকসত্তার অনুভব দু'রকম। সমাজ - সংসারও সমকাল দান্তের পক্ষে সুসহ ছিল না। তাই মর্ত্যলোকে অনুভব দু'রকম। সমাজ সংসার ও সমকাল দান্তের পক্ষে সুসহ ছিল না। তাই মর্ত্যলোকে ভ্রান্ত পথিক তিনি; উদ্ধার খেঁ াজেন প্রেমে। বিষ্ণু দের মধ্যে জনসংযাগহীনতার জন্য বেদনাই মর্মরিত হয়েছে। বিযুক্তি তাঁর কাম্য নয়; অথচ মেলাতে না প ারার আক্ষেপ এখানে ধ্বনিত। "রাজা"নাটকে সুদর্শনা রাণীর গর্বে রাজা-র স্বরূপ দেখতে পায় নি। অন্ধকারে তাই মিলিত হন রাজার সঙ্গে। শামসুর রাহমান বলতে চান তাঁরথেকে এগুলি প্রযোজ্য নয়। সুদর্শনার মতো আত্মগর্বে স্ফীত নন তিনি; দান্তের মতো শুধু নারীর প্রেমে উদ্ধার খোঁজেন না বিষ্ণু দের মতো নিজেকে অনাহত আগন্তুকও ভাবেন না। যে জ ানতে চান তাঁর মনের, প্রাণের কথা। স্বাধীনতা ও দুই বাংলার বিভাজনের পর ওপার বাংলায় যে স্মরণীয় ভাষা আন্দোলন হয়, সেখানে কবি দায়িত্ব বেড়ে যায়। মাতৃভাষায় আপন কথা বলার দাবি জানাতে চান। অথচশাসক দল চায় কবি - শিল্পী বুদ্ধিজীবীর ত্রীতদাস থাকুন। কবির অপেক্ষা---

কেন তবে হরবোলা সেজে সারাক্ষণ হাটে মাঠে
বাহবা কুড়াবো ...
কেন মুখে রঙ মেখে হবো সঙ?

ষাট দশকে এই কবিতা লেখার প্রেক্ষিতটা জানা দরকার।
১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারিতায় পাকিস্তানে বৈষম্য ও উৎপীড়ন শু হয়। ১৯৬২তে সামরিক শাসনের অবস ান ঘটে। অন্যদিকে শিক্ষাকমিশন নিয়ে শু হয়, ছাত্রআন্দোলন। ১৯৬৩তে প্রেস অ্যান্ডপাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স জারি হলে সাংবাদিকরা প্রতিবাদে হরতাল করেন। সাংবাদিক ও কবি শামসুর রাহমানের এই সময়ের আগুন পোড়া যন্ত্রণা ও জিজ্ঞ াসা এই কবিতায় পাই।
এঁর আত্মসমীক্ষা ও আত্মবিলাপ -- যা একইসঙ্গে বেদনাঘন ও ব্যঙ্গাত্মক, ফুট উঠেছে "প্রভুকে" কবিতায়। যেখানে দাঁড়ে বসা তোতাপাখি হতে চান না তিনি অথচ সেই অপরাধে পেতে হয় শাস্তি- "নিজস্ব কথা বলবার গুভার" সহ্য করতে হয়। আবার "দুঃস্বপ্নের একদিন" কবিতায় যেন কাম্যুর অ্যাবসার্ড দর্শন ছায়া ফেলে। শুধু দিনযাপনের ও প্রাণধারণের গ্লানি নিয়ে গড্ডল প্রবাহে ভাসেন তিনি (অর্থাৎ সকলেই)---

কাজ করছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, কাজ করছি,
যাচ্ছি দাচ্ছি, চকচকে ব্লেজে দাড়ি কামাচ্ছি, দু'বেলা
পার্কে যাচ্ছি, মাইক্রোফোনী কথা শুনছি
ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাচ্ছি।

একই আত্মবিদ্রূপ ও বেদনা - বিষণ্ন সুর পাই "দুঃসময়ের মুখোমুখি" কবিতায়। বহিমান রোম সাম্রাজ্য। তবু নীরোর মত বেহালা বাজাবার বিলাসিতা কেন? এই প্রশ্ন কেউ কিছু নয়। এজন্য বাচচুকে চলে যেতে বলেন কবি। ব্যস্ততার ভান দেখান। বলেন,

আমি শামসুর রাহমান, মানে ভদ্রলোক, দিব্যি
ফিটফাট, ক্লীন গাল ব্লেডের কৃপায়
আর ধোপদুররস্ত পোশাকে

"আইডিয়া অভিয়ানে" ব্যস্ত এক কবি ও সাংবাদিক। যদিও কর্মে আর কথায় সত্য অর্জন তিনি করেন নি, জানান।

চিনতিস্ তুই যাকে সে আমার
মধ্য থেকে উঠে
বিষম সুদূর ধূ-ধূ অন্তরালে চলে গেছে।

এখানেই তাঁর বিবেকী সত্তার জাগরণ লক্ষ্য করি।

।। পাঁচ ।।

বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক ঐতিহাসিক ঘটনা ভাষা আন্দোলন। ভারত ভাগ হওয়ার পর পাকিস্তানি সরকার নির্দেশ দেয় উর্দু-কে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। যদিও পরিসংখ্যান বলে, সেইসময় অর্থাৎ ১৯৪৮ এ পাকিস্তানে মোট ছ'কোটি নববই লক্ষ মানুষের মধ্যে চারকোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষই ছিলেন বাংলাভাষাভাষী। শতকরা আড়াই ভাগ ছিল উর্দুভাষী। জোর করে বাংলাভাষাকে সরিয়ে দেবার প্রতিবাদে সুপণ্ডিত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সক্ষোভে বলেন, যাঁরা

...ব্যবহার্য্য ভাষারূপে উর্দুর পক্ষে ওকালতি করিতেছেন আমি তাঁহাদিগকে

কাণ্ডজ্ঞানহীন পণ্ডিত - মূর্খ ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারি না।

(দৈনিক আজাদ পত্রিকা/২১ ডিসেম্বর ১৯৪৭)

এরপর সরকার পক্ষ নানা যুক্তি, কুযুক্তি দেখান। চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। ছাত্ররা বাংলা ভাষার অবমাননায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির বাংলার সপক্ষে দাবি জানিয়ে ১৯৫১ সালে ১১ মার্চ এক স্মারকলিপি পাঠায়। অথচ১৯৫২র ২৬ জানুয়ারি ও ২৭ জানুয়ারি নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ তাদের সভায়, মঞ্চে ঘোষণা করেন --- একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দূ। ছাত্রসমাজ এর প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারি ধর্মঘট করে। রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলার দাবি প্রতিষ্ঠায় ব্যাজ তৈরি হয়, অর্থ সংগ্রহ চলে, পতাকা দিবস পালিত হয়।

১৯৫২র ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের জন্য বিদ্যবিদ্যালয়ে নানা স্থান থেকে ছাত্রছাত্রীরা জড়ো হয়। বেলা বারোটায় শু হয় ঐতিহাসিক সভা। ১৪৪ ধারা আইন অমান্যের ডাক দেওয়া হয়। বেলা দুটো পর্যন্ত চলে মিছিল ও পুলিশি তৎপরতা। লাঠি ও গুলিতে আহত ও মৃতের সংখ্যা বেড়ে যায়। শহীদ হন আবদুল জববর, রফিক উদ্‌দিন আহমদ, আবুল বরকত। বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দেওয়া তণদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাষা জানাতে ২৩ ফেব্রুয়ারি তৈরি হয় শহীদ মিনার। কিন্তু সরকারের জঙ্গী বাহিনী সেইমিনার ভেঙে দেয় ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে। পরে আবার তা' গড়ে দেওয়া হয়। ভাষা আন্দোলনের স্মারক এই শহীদ সম্পর্কে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম লিখেছেন---

এই শহীদ মিনারেই সংগ্রামী বাঙালীর উত্তরণ

ঘটেছে স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে।

(ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার)

তিনি আর বলেন,

একুশের রক্তাক্ত সংগ্রামের ফলে ছাত্রদের বাংলাভাষা দাবী জনসাধারণের স্বাভাবিকভাবেই কবি - সাহিত্যিকরা অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হন একুশে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে গান - কবিতা - কল্প ইত্যাদি লিখতে। আলাউদ্দিন আল আজাদ লেখেন ---

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার

ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো

চারকোটি পরিবার

খাড়া রয়েছি তো

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী গেয়ে ওঠেন ---

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফ্রেব্রুয়ারি

আমি কি ভুলিতে পারি?

গল্প লেখেন শওকত ওসমান (মৌন নয়), সাইয়িত অতীকুল্লাহ (হাসি), আনিসুজ্জামান (দৃষ্টি), রাবেয়া খাতুন (প্রথম বধ্যভূমি), জাহির রায়হান (কয়েকটি সংলাপ ও একুশের গল্প) প্রমুখ।

দায়বদ্ধতার কবিরূপে শামসুর রাহমানকেও পাই এই ভাষাআন্দোলনে। কবিরূপে যিনি মাতৃভাষাকে বলেন 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনি বর্ণমালা" এবং স্বীকার করেন,

"নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বল পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়"

ভোরে শোনেন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ধীরোদাত্ত স্বর 'পাখি সব করে রব।' উচ্চারণ করেন সেই সত্য---

হে আমার আঁখিতারা তুমি উন্মীলিত সর্বক্ষণ জাগরণে।
তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার?
রক্তের বিনিময়ে যে একুশে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা দিবসের মর্যাদা পেলো, তার স্মরণে কবি লিখলেন, ''একুশের রক্তচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ''। আর ১৯১৯এও দেখবেন
আবার সামাল নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ,
বরকত বুকে পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।
সামালের বুক আজ উন্মথিত মেঘনা
সামালের চোখ আজ আলোকিত ঢাকা
সামালের মুখ আজ তণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।
(ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯)
ভাষা আন্দোলনের যে ভাষাপ্রীতি জনিয়ে আছে, তাকে কবি কিভাবে ভুলবেন? তাই ''আসাদের শাট'' কবিতায় লিখলেন---
আমাদের দুর্বলতা, ভীতা, কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।
১৯৭৮এও কবি বাংলা ভাষার প্রেমে ও স্মৃতিতে উদ্বেল। ১৯৫২র সেই রক্তঝরা দিনগুলি মনে পড়ে যায় তাঁর। নিসর্গে, মানুষের অবয়বে, শাক - সব্জি - সর্বত্র স্মৃতির দাগ দেখেন। আর সত্তার ভিতরে অনুভব করেন 'যেন কিছু করবার আছে'। বুকে, করতলে স্বপ্ন জাগে এবং তখনি 'প্রক্যেকটি পথ কেমন উৎসব হয়'। আর তৎক্ষণাৎ
মনে পড়ে, দিকচিহ্, গোরস্থালি, নক্ষত্র দুলিয়ে
অভিমানী বাংলাভাষা সে কবি বিদ্রোহ করেছিল।
(অভিমানী বাংলাভাষা)
স্বদেশ ও মাতৃভাষাকে যে শাসকশক্তি 'লাশ' বানাতে চায়, তাদের প্রতি কবির জিজ্ঞাসা 'এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়? যোগ্য সমাধিস্থাপন কোথাও নেই, তাই কবির ঘোষণা,
হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই।

।। ছয় ।।
''আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ঠিক এভাবে বলতে পারলে খুশি হতেন শামসুর রাহমান। তংার কাব্যগ্রন্থের প্রায় সিংহভাগ জুড়ে আছে স্বদেশ - কেন্দ্রিক আবেগ, আনন্দ, ক্ষোভ। যে - সময়সীমায় তাঁর চেতনার জাগরণ ঘটেছিল, তা ছিল ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন। এরপর এলো ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান। আইয়ুব খানের স্বৈরাচারিতার বিদ্ধে খে দাঁড়িয়েছিলেন জনগণ। যার সূচনা ১৯১৮ সালের নভেম্বর - ডিসেম্বরের। ১৯৫২ আর ১৯৯৭১র মধ্যবর্তী এই সময় পূর্ববাংলা ছিল অস্থির, উত্তেজিত। ''পূর্ববালার এই অভ্যুত্থান এক বিপ্লবী অবস্থা সৃষ্টি করেছিল'' বলেছেন মোহাম্মদ ফরহাদ। যে গণআন্দোলনে বিপর্যস্ত আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। দায়িত্ব নেন জেনারেল ইয়াইয়া খান। তিনি আশ্বাস দেন নির্বাচন করবেন ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবেন। আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন----
এটা হচ্ছে গণভোট। বাংলাদেশে গণভোট। বাংলাদেশ হতে দালালদের ভোটের বাক্স খালি করতে
চাই। (১৯৭০ এর ৭ জুনের ভাষণ)
কিন্তু নানা টালবাহানায় ইয়াহিয়া সরকার বারবার ভোট পিছিয়ে দেন। শেষপর্যন্ত ভোট হলে দেখা যায় আওয়ামী লীগই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। এর পরই আসে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রসঙ্গ। কিন্তু সরকার অধিবেশন করেন না। মুজিবুর রহমান অবশ্য সদস্যদের নিয়ে রেসকোর্স মাঠে গণশপথ গ্রহণ করেন। আইনানুগ ব্যবস্থা না হওয়ার শেষে ১৯৭১ এর ৭ মার্চ

তিনি রেসকোর্স ময়দানের সরকারের বিদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । বলেন,
তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা।
তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।
মুজিবরের সঙ্গে সরকার পক্ষ এরপর আলোচনায় বসেন। সমঝোতা হয় না। তাঁর ফলে, ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ শু হয় সেন াঅভিযান ও গণহত্যা। নিরীহ জনগনকে হত্যার এই ববর্রতা অন্য দেশে মেনে নিতে পারে নি। বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষ এসে দাঁড়ায় পূর্ববঙ্গবাসীর পাশে। শু হয় মুক্তিযুদ্ধ। নয় মাস ধরে চলে যুদ্ধ। ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি কুশাসন থেকে মুক্ত হয় আজকের বাংলাদেশ। অনেক অশ্রু - ঘাম - রক্তের বিনিময়ে আসে স্বাধীনতা। অনিবার্যভাবে এই আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ ছাপ ফেলেছিল ওপার বাংলার সাহিত্যে। কবি শামসুর রাহমান লিখলেন
তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?
আমাব কারফিউ দেখে ব্যথিত কবির মনে প্রশ্ন জাগে --- "এ শহরে কি আজ কেউ নেই? কেউ নেই"? নয়াবাজার পুড়ে গেলে তাঁর মনে হয়, দেশজননী যেন প্রিয়া হয়ে বলছে--- "আমাকে বাঁচাও এই বর্বর আগুন থেকে, আমাকে বাঁচাও।" শেষপর্যন্ত বাঞ্ছিত স্বাধীনতা এলে, কবি তাঁর ভাষাবেগ গোপন রাখতে পারেন না। চান না। বলেন,
স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজল, ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা --
অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ মনে করেন ধ্রুবপদের মতো "স্বাধীনতা তুমি" শব্দবন্ধ উচচারিত হয়ে শ্লোগান হয় নি; হয়েছে "প্রিয় ডাকনাম ধরে ডাকার মতো অন্তরঙ্গ"। বলেছেন,
স্বাধীনতাকে তিনি সাজিয়েছেন নানা রঙে - রূপে - সুরে; আর সেই রঙ - রূপ - সুর তিনি সংগ্রহ করেছেন বাঙ্লার স্বপ্ন - নিসর্গ - জীবন থেকে; (নিসঃঙ্গ শেরপা)
"বন্দী শিবির থেকে" কাব্যে তিনি দেখেছেন 'বন্দীদের ব্যথা লেগে আছে'। জঙ্গীসেনাদের দাপটে দেশ জনশূন্য; প্রাণী শূন্য। শুধু
নগ্ন রৌদ্র চতুর্দিকে, স্পন্দমান কাক, শুধু কাক (কাক)

।। সাত ।।
কবি হিসেবে তিনি দায়বদ্ধ, কমিটেড -- একথা শামসুর রাহমান নানা লেখায়, সাক্ষাৎকারে বলেছেন। তবু সেই তিনি অনুরোধ জানান ---
কবিদিও না দুঃখ, একান্ত আপন দুঃখ তাকে
খুঁজে নিতে দাও।
চেয়েছেন বারংবার 'রূপান্তরিত' হতেও। কবিতাকে ভালোবেসে সুন্দরের অভ্যর্থনায় প্রস্তুত হন। ভালোবাসার জন্য উৎসুক, ব্যাকুল হন। প্রেমে, শরীরী আস্বাদে উজ্জীবিত হতে চান। মানুষ ও কবিরূপে যা অস্বাভাবিক নয়। তিরিশের কবি ও কবিতা যাঁর প্রেরণাছিল, তাঁর পক্ষে নারী ও প্রেম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। যেজন্য হুমায়ুন আজাদ বলেন,
শামসুর রাহমানের মনোবিশ্বের উজ্জ্বলতম খণ্ডের নাম প্রেম, -- যা তাঁর এক প্রধান কাব্যপ্রেরণা।
কবিতাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে" (১৯৬০) উৎসর্গপত্রে যা লেখেন, তার আংশিক ছত্র এই রকম আজো হে সুদূরতমা

ভালোবেসে তোমাকে দিলাম।
তবু এই কাব্যের প্রেমের কবিতাগুলি ''কোনো তণীকে উপস্থিত করে না'' বলেছেন অধ্যাপক আজাদ। এই কাব্যে কবি যখন বলেন, 'মাসের মূঢ়তা ছেড়ে নৈঃসঙ্গে সম্পন্ন হয়ে চলি, তখন আত্মরতিই যেন চোখে পড়ে।
''রৌদ্রের করোটিতে'' এসে কবির সুর বদল হয়। লিপিস্টিকরঞ্জিত, হাইহিল পরা তন্বী মেয়ের কিছু অঙ্গভঙ্গি, চাপল্য দেখেকবি বলেন, ''কী করে বোঝাই কতো ভালো লাগে তোমাকে তখন''। যে ভালো লাগার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কামব াসনাও।
''রূপান্তর'' নামের এই কবিতাটিতে আছে দেহভাবের নানা বিভঙ্গ। যেমন,
ক. বুকের উপর কালো বেণী
খ. চিবুকে ঘামের ফোঁটা
গ. ঝকঝকে দাঁতে
ঘ. নখ খাও
ঙ. খিল্‌খিল ওঠো হেসে
''পুজাকালে'' কবিতায় একটি উপমা টেনেএনে কবি তাঁর প্রেমবাসনাকে মূর্ত করেছেন। পুরাকালে জনৈক বণিক বাগানের মাটির গভীরে যে মুক্তো লুকিয়ে পুঁতে রেখেছিলেন, কবি বলেন,
তোমাকে পাওয়ার ইচ্ছা সেই
মুক্তোর মতোই জ্বলে আমার ভেতর রাত্রিদিন
এই ভাবনায় ঈষৎ কীট্‌স এবং অনেকটা জীবনানন্দকে পাওয়া যায় (দ্র. ওড টু নাইটিঙ্গেল এবং শিকার কবিতা)। ''তুমি ফিরে না আস'' কবিতায় আরেক ব্যাকুলতা দেখি
আমার হাত কাতর ভায়োলিন হয়ে ডাকছে
---তুমি এসো,
আমার ঠোঁট তৃষ্ণার্ত তটরেখার মতো ডাকছে
--তুমি এসো।
আর এই আহ্বানে তাঁর আমিষাশী হৃদয় মিশে যায় ত্রমে। তাঁর কিছু কবিতাংশ উদ্ধৃত করে দেখাতে পারি যৌনতা ও প্রেম কেমন যুগলবন্দী রচনা করেছে।
১. ছড়িয়ে যুগল ঊ বসে আছো গৈরিক ডিভানে,
তুমি শুধু তুমি। (তোমাকে দেখে)
২. নিপোশাক তোমার শরীর
জ্যোৎস্নাধোয়া মসজিদের মতো (ওডেলিস্ক)
৩. হয়তা ব্রা খুলে দাঁড়াবে স্নানাগারে
গা জুড়ে কোমল নেবে জলের আদর (দরজার কাছে)
৪. তবুও তোমার স্পর্শে জেগে ওঠে এ ধূ ধূ
জীবনে দ্বীপের মতো দ্বিতীয় যৌবন জয়োল্লাসে (দ্বিতীয় যৌবন)
৫. এখনো তাকেই ভাবি যে আসে হঠাৎ
অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো মনের নিঃসীম বিছানায়, পুনরায়
চকিতে মিলিয়ে যায়। (চরিতে সুন্দর ত্যাগে)
৬. অসিত শিখার মতো চুল আর স্তনাভা তোমার,
দাও, দাও, আমাকে দেখতে দাও। (যে কথা কেউ বলে নি কেউ)
৭. তোমার যুগল স্তন স্বর্গ হয়ে রাত্রির নরকে (জার্ণাল, শ্রাবণ ৩)
৮. তুমি এলে প্লাবনের পরে,

যে তুমি আমার স্বপ্ন, অন্নজল, অস্তিত্বের গান। (যে তুমি আমার স্বপ্ন) তবু তাঁর সব প্রেম যেন, উদ্‌বর্তিত হয় স্বদেশ, মাতৃভাষায়। দেশজননী ও প্রিয়াকে একবৃন্তে ধারণ করতে চান কবি। তাই বলতে পারেন ---

।। আট।।

দেশকাল - সচেতন কবিমাত্র মিথপুরাণের প্রতি আকৃষ্ট হন। একধরনের বিনির্মাণ তাঁকে সাহায্য করে পুরাণের, মুখচ্ছদে নতুন কথা বলার জন্য। যদিও শামসুর রাহমান সমগ্র জাতির ভাষা ও ভাষ্য রচনার জন্য পুরাণের দ্বারস্থ হন নি। হুমায়ুন আজাদের মতে, "শামসুর রাহমান পুরাণ ব্যবহার করেন ব্যক্তির মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্যেই"। তাঁর "চাঁদসদাগর", "স্তনের স্বগতোক্তি", "ডেডোলাস" ও "ইকাসের আকশা," কবিতায় ব্যক্তির প্রাধান্য দেখা যায়। ইকাসে কবি নিজেকে একাত্ম করেছেন। আর চাঁদ - মনসার দ্বন্দ্ব আখ্যান প্রচলিত ভাবনা প্রাধান্য পেলেও মনসা হয়ে উঠেছেন 'সর্বহারাদের প্রতীক'। আজাদের ভাষ্যে "যে চাঁদের মতো সামন্ত ধনিকদে পরাভূত করবেই" --- এই ভাবনার প্রয়োগ একালে বাঞ্ছনীয় ছিল।

টেলেমেকাস ও স্যামসন কবিতা দুটি তাঁর পুরাণচিন্তা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে নতুনত্ব এনেছে। অডিসিয়ুসের পুত্র ভাগ্যহত টেলেমেকাস। দেবতার অভিশাপে অডিসিয়ুর্স সমুদ্রে পথ হারান, তাঁর রাজ্য ইথাকা আক্রান্ত হয়। পিতার জন্য পুত্র অপেক্ষা করে। শামসুর রাহমান এই গ্রীকপুরাণকে নিজের মতো ব্যবহার করেছেন। পরাধীন বাংলাদেশে তাঁর কাছে 'ইথাকা'; স্বাধীনতা এখানে পিতা অডিসিয়ুস। আর তিনি টেলেমেকাস।

ইথাকায় রাখলে পা দেখতে পাবে রয়েছি দাঁড়িয়ে
দরজা আগলে, পিতা, অধীর তোমারই প্রতিক্ষায়।

স্যামসনের শক্তির উৎস তার চুল। তা ছেঁটে দিয়ে তাকে বন্দী করলে বুঝি আর ভয় নেই যে রাজশক্তি ভেবেছিল, তারা ভুল করেছিল। মাথায় কেশোদগম হলে স্যামসন শক্তি ফিরে পান ও সব ভেঙেচুরে দেন। কবি শামসুর তাঁর প্রতিবাদ জানাতে এই স্যামসনকে প্রতীকরূপে বেছে নিয়েছেন। আরোপ করেছেন নিজের উপর। একদিকে আর্তনাদ

হীনবল, শৃঙ্খলিত
আমি, তাই সর্বক্ষণ করছ দলিত।

অন্যদিকে অপহৃত শক্তির পুজ্জীবনে বলেন --

তখন সুরম্য প্রাসাদের
সব স্তম্ভ ফেলবে উপ্‌ড়ে, দেখো, কদলীবৃক্ষের অনুরূপ। দম্ভ
চূর্ণ হবে তোমাদের,

পুরানের অনুষঙ্গে এসে ল্যাজারাস, অর্ফিয়ুস, অ্যাপেলো, অ্যাপ্রেদিতি ইত্যাদি নাম ও তার ব্যবহার । যার মধ্যে কবি ও তাঁর সমকালকে চেনা যায়

।। নয় ।।

উত্তররবীন্দ্রযুগের কবিদের মতো শামসুর রাহমানও কবিতার ভাব - ভাষা - ভঙ্গির জন্য পশ্চিমের কবিদের কাছে অধমর্ণ হয়েছেন। ভালো ও প্রতিভাবান কবিরা একাজ করতেই পারেন। এলিঅটই তো বলেছিলেন কুম্ভীলকবৃত্তি নিন্দনীয়; স্বীকরণ কিন্তু প্রশংসনীয়। বুদ্ধদেব বসু প্রাণিত শামসুর রাহমান ভালোবেসেছেন বোদলেয়ারকে। তাঁর "রৌদ্র করোটিতে" কাব্যে যে সূর্যপ্রসঙ্গ পাই, তা বোদলেয়ারের 'সূর্য' কবিতার প্রভাবসঞ্জাত। এছাড়াও আছে নাগরিক জীবনের নানা ক্লেদ, হতাশা, কাম, অসংগতিও।

১. সবাই অলক্ষ্যে পায় সূর্যের প্রসাদ
সমপরিমাণে। (সূর্যাবর্ত)
২. অসংগতি, না আমার মধ্যে নেই, রয়েছে সেখানে
রেস্তোরাঁয়, অন্ধকার দেয়ালে, আমার চতুর্দিকে (আত্মহত্যার আগে)
৩. আমার মাথাটা যেন বহিমান একটি শহর

যেখানে মানুষ, যান, বিজ্ঞাপন, রেডিয়োর গান (স্বগত ভাষণ)
এলিঅটের কবিতা দুটি বাংলার কবিদের গভীর ভাবে প্রাণিত করেছে। 'আঘাটায়' কবিতায় শামসুর লেখেন,
উপরন্তু শূন্যের সহিত শূন্য ত্রমাগত
যোগ দিয়া চলি ফলাফলহীন।
পড়লেই মনে পড়ে The WasteLandএর
I cannot connect
ত্বপ্সব্ধড়ন্তব্ধ ভ্রনব্ধড় ত্সব্ধড়ন্তব্ধছবড়ন্দ্ব ণ্ঠনব্জন্দ্ব ত্রন্দ্বব্জপ্পপ্সস্নগ্ন
"যখন রবীন্দ্রনাথ" কবিতায়
তিনিও ধুলোয় মিশে ভুললেন কাঞ্চনকামিনী,
ত্বকের নিবিড় লেনদেন।
এলিঅটে পড়ি---
Forget the Cry of Gulls, and the deep sea
ট্টস্তু ব্ধড়ন্দ্ব স্নাব্জপ্সন্দ্রনব্ধব্রস্তু প্তপ্সব্দব্দ. ছড্ডন্দ্বব্ধড় স্তুব্রব্ধন্দ্বব্জগ্ন
এলিঅটীয় পোড়ো জমি ছড়িয়ে যায় তাঁর কাব্যে।
১. নিমেষেই সাধের বাগান
ভরে ওঠে অকন্টক ফণিমনসায় (গোষ্পদ ও মন)
২. কান্নাগাঁথা রক্ষ এই মর আকাশে
এখনো কি স্বপ্ন বোনে উর্ণনাভ চাঁদ (আমার মাকে)
৩. কাঠিন্য লেগেছে শুধু, আর চারদিকে পোড়োজমি ৯রবীন্দ্রনাথের প্রতি) অড্রিয়ান হেনরি
তাঁর কবিতায় পুনক্তির কাব্যিক ব্যবহার করেন, যেমন,
Love is Fish and chips on winter nights
ন্প্স্নন্দ্ব নব্দ স্তুব্রুন্সন্দ্বব্ধব্দ ন্দ্রপ্তপ্ত প্সন্দ্র ব্দব্ধব্জব্রুব্ধন্দ্ব স্তুন্দ্বপ্তনব্ধড়ব্ধব্দ
ন্প্স্নন্দ্ব নব্দ ভ্রড়ন্দ্বক্ত ভ্তপ্সত্ত স্তুপ্সস্ন'ব্ধ স্নাত্তব্ধ প্সত্তব্ধ ব্ধড়ন্দ্ব প্তনব্ধড়ব্ধ ছন্প্স্নন্দ্ব নব্দগ্ন
শামসুর রাহমান লেখেন---
স্বাধীনতা তুমি
উঠানো ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন।
স্বাধীনতা তুমি
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদীর রঙ। ইত্যাদি
কবি ইয়েটসের The Second Coming কবিতাটি শামসুর রাহমানকে উদ্বুদ্ধ করেছে দেখা যায়। তাঁর "বিপর্যস্ত গোল াপবাগান" কবিতায় কবি লিখেছেন---
ঘোর মরীচিকা কাঁপে দশদিক
নাৎসী - প্রেতের বিকট ঘূর্ণি নাচে।
এবং শেষ স্তবকে লেখেন,
মৃত্যু নিয়ত জীবনের প্রতিবেশী।
প্রেত - সৈকতে অদীন ভেলায়
আসবে কি তুমি কান্তা মুক্তকেশী?
ইয়েট্স লিখেছেন---
Mere anarchy is loosed upon the World
বড়ন্দ্ব চপ্তপ্সপ্সস্তু — ড্ডনপ্পপ্পন্দ্বস্তু ব্ধনস্তুন্দ্ব নব্দ প্তপ্সপ্সব্দন্দ্বস্তু স্থ
এবং কবিতায় শেষে বলেছেন,

Its hour come round at last,
ত্রপ্তুপ্সভ্তস্তুড়ন্দ্ববন্দ ন্ধপ্সভ্রুক্তজস্তুবন্দ Bethlehem to be born?
অবশ্য বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব ব্যাখ্যায় একজন সৎ কবির কবিকৃতির কোনো অবমূল্যায়ন ঘটে না। বরং তাঁর পাঠপরিধি আমাদের চমৎকৃত করে। সেইসঙ্গে তাকে আত্মস্থ ক'রে অপূর্বনির্মাণপ্রতিভার পরিচয় দিয়ে কবি আমাদের কৃতার্থ, মুগ্ধ করেন।

।। দশ ।।

একসময় ছিল, কবিরা অলঙ্কৃত বাক্যে পাঠকদের মনোহরণ করতেন। শব্দালঙ্কারের চাতুর্যকে সরিয়ে মহাকবি কালিদাস আনলেন উপমার অপূর্ব প্রয়োগ। যার তুলনা মেলে রবীন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি জীবনান্দ দাশ নিয়ে এলেন 'চিত্ররূপময়' কবিতা অর্থাৎ চিত্রকল্পের বর্ণালি। যা আজও বাঙালি কবিদের কবিত্বের উজ্জ্বল আয়ুধ। সামসুর রাহমান তাঁর কবিতায় উপমা আর চিত্রকল্প প্রয়োগে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাই এ বিষয়ে সামান্য আলোচনা না করলে সম্ভবত তাঁর কবিকৃতির পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন হবে না। চিত্রকল্প প্রয়োগে তিনি কেমন সংবেদনশীল, ইন্দ্রিয়সংরাগময় এবং দেশকালসচেতন এক সময়জাগর কবি তাও দেখা যাবে।
সি. ডে.লুইসের অনুসরণে যদিও বলা যায় 'ইমেজ' (চিত্রকল্প) হলো র্ত্র ভ্রপ্সক্তজস্তু-ন্মনস্তুব্ধভ্তক্তজন্দ্ব স্তুড্রুক্তজন্ধন্দ্বস্তু ভ্রনন্ধড় ন্দ্বপ্পপ্সন্ধনপ্স', তবু তা শেষ কথা নয়। ভালো চিত্রকল্পে কবির স্বপ্ন-কল্পনা - বোধ গভীরভাবে মুদ্রিত হয়। শৈলীবিজ্ঞানের ভাষায় চিত্রকল্পে পাই দুটি স্তর -Surface Structure ও Deep Structure যা দেখছি, তার পরেও আছে গহন অনুভব; ব্যঞ্জনা। হুমায়ুন আজাদ তাঁর "নিঃসঙ্গ শেরপা" গ্রন্থে বলেছেন, চিত্রকল্পে থাকে ত্রিবিধ গুণ -- অভিনবত্ব, তীব্রতা ও আবেগ- স্বপ্ন - কল্পনা উদ্রেক শক্তি, এজরা পাউন্ডকে সাক্ষী মেনে উদ্ধৃত করেছেন তাঁর বক্তব্য   'তা-ই চিত্রকল্প, যা বিশেষ মুহূর্তে উপস্থিত করে মেধা ও আবেগগত যৌগ।' আমরা এলিঅটের অপারেশন টেবিলে শোয়া সেই 'ইথারাইজড পেসেন্ট' সন্ধ্যায় চিত্রকল্পকে এ প্রসঙ্গে ভাবতে পারি।
শামসুর রাহমানের কবিতায় চিত্রকল্পগুলিকে দু'ভাগে প্রধানত ভাগ করা যায়। একদিকে আছে দৃষ্টি ও স্পর্শের যৌগ রসায়নে স্বাদ-গন্ধ-বর্ণময় চিত্রকল্পকে এ প্রসঙ্গে ভাবতে পারি।
শামসুর রাহমানের কবিতায় চিত্রকল্পগুলিকে দু'ভাগে প্রধানত ভাগ করা যায়। একদিকে আছে দৃষ্টি ও স্পর্শের যৌগ রসায়নে স্বদ - গন্ধ- বর্ণময় চিত্রকল্প; অন্যদিকে আছে
১. সুপুষ্ট স্তনের মতো ফল আর ফাল্গুনের ফুল
২. নর্তকী শিখার মতো সফেদ তণ ঘোড়া এক
৩. করোটিতে জ্যোৎস্না জ্বলে / বিষণ্ন স্মৃতির মতো
৪. ভোর ফুটলো তণ ফুলের মতো
৫. শূন্যে ফোটায় রক্তগোলাপ, হৃদয় যেন
৬. ঘোড়ার নালের মতো চাঁদ ঝুলে আছে।
একজন কবিকে এসব উপমায় ও চিত্রকল্পে চেনা যায়। তবে দায়বদ্ধ ও বিবেকী কবি স্বকালচেতন হয়ে যেসব চিত্রকল্প রচনা করেন, তাতে তাঁর মনোভাব আরও স্পষ্ট ও অব্যর্থ হয়ে ওঠে
১. জীবন মানেই
মাথলা মাথায় মাঠে ঝাঁ ঝাঁ রোদে লাঙল চালালো
২. সালামের বুকে আজ উন্মথিত মেঘনা
৩. জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায় নীলিমায়
৪. স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান
বয়েসী বটের ঝিলিমিল পাতা
৫. ছিলাম পড়ে কাঁটাতারে বিদ্ধ হয়ে

দিনদুপুরে
৬. বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি, নিথর বিশাল
৭. কান্তিমান মোরগের মতো মাথা তুলে
কখনো একটি দিন দেয় ডাক।
৮. উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ বিরানায়
৯. আল খাঁ খাঁ, পথপার্শ্বে বৃক্ষেরা নির্বাক
নগ্ন রৌদ্র চতুর্দিকে, স্পন্দমান কাক, শুধু কাক।
১০. আমি ভাঙা বাবুই পাখির বাসা,
বড়ো একা পড়ে আছি স্বপ্নহীন দীর্ঘ বারান্দায়।

এইসব চিত্রকল্প মূল কবিতার সঙ্গে আদ্যন্ত পড়লে সজাগ পাঠক অবশ্য উপলব্ধি করতে পারবেন, নিছক প্রাকরণিক দক্ষত ারজন্য কবি শব্দচিত্র আঁকেন নি। যে সময় বহমান ও অতীত -- দুই - ই তাঁর চিত্রকল্পে দেখাতে চান। যেখানে সালাম, বন্দী বাংলা, দুঃখিনী বর্ণমালা একসূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। আর তার সঙ্গে মিশে থাকে 'বহু জনতার মাঝে অপূর্ব এক' কবির দীর্ঘশ্বাস -- স্বপ্নহীন বারান্দায় পড়ে থাকা। তবু তিনি হতাশার বা মৃত্যুবোধের কবি নন। ব্যক্তি থেকে বিশ্ব তাঁর ভালোবাসা প্রসারিত। যেজন্য ''স্লোগান'' নামের কবিতায় কবি তাঁর জীবনদর্শন লিপিবদ্ধ করেন -- যা তাঁরই কবিসত্তার অভিজ্ঞান

অশুভের সাথে আপোসবিহীন দ্বন্দ্ব চাই
এখনো জীবনে মোহন মহান স্বপ্ন চাই।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com